গাঁয়ের ইস্কুলের লেখাপড়া শেষ করে বেশ কিছুদিন গরুমোঘ চরিয়ে ছিলাম। আমাদের একপাল গরু ছিল, ভেড়াও ছিল। বর্ষার গরু চরানোর সমস্যা ছিল। কারণ প্রবল বৃষ্টির মধ্যে ঘাসে মুখ দিয়ে গরু চরতে চায় না। ভেড়ার স্বভাব এর উল্টো রকম। যত বাদলা হোক না কেন ভেড়াকে নিয়ে মাঠে নামতে হবে। তা নইলে একপাল ভেড়া এমনভাবে তারস্বরে চেঁচাতে থাকে যে মসজিদের আজান আমাদের বাড়িতে পৌঁছতে পারে না। গৃহপালিত পশুদের মধ্যে সবচেয়ে নোংরা হচ্চে ভেড়া। শুধু নোংরাই নয়, বোধবুদ্ধি হীন। গোয়াল থেকে কোন ভেড়াকে শেয়ালে কান চেপে ধরলে বিনা প্রতিবাদে তার সঙ্গে চারপায়ে হাঁটতে শুরু করে। সামান্য ভ্যা করে প্রতিবাদ করতেপারে না। এরকম স্বভাব যাদের তাদেরকেই ভেড়াকান্ত বলা হয়। আমি অনেকটা ওইরকম স্বভাবের ছিলাম। তা নইলে আমাদের যৌথ পরিবারের অতগুলো ছেলেপুলেথাকা সত্ত্বেও শুধু আমাকেই কেন ঘনঘোর বর্ষায় ভেড়া চরাতে যেতে হবে। আসলে ভেড়াগুলো যখন বিকট আওয়াজে চেঁচাতে থাকে তখন আমি আর ঘরে বসে থাকতে পারতাম না। গোয়ালের হুড়কো খুলে তালপাতার ছাতা নিয়ে বেড়িয়ে পড়তাম। আমার বড়চাচা বাড়ির মোড়ল। ভেড়া চরানোর জন্য একটা রাখালের খোঁজ করছিল কিছুদিন ধরে। কিন্তু আমাকে ভেড়া চরাতে দেখে ওসব ভাবনা ছেড়ে দিল অবশেষে। আমার বাবা ছিল অনেকটা ন্যাকাবোগা ধরণের। তার ছেলে আমি। বর্ষা বাদলায় ভেড়া চরাই। চরাতে চরাতে আকাশের মেঘ, মেঘের বৃষ্টি আর ঝাপসা নির্জন মাঠের মধ্যে হারিয়ে যেতাম।

একবার আমার নানা আমাদের বাড়ি আসল। হ্যাঁ, তখন বর্ষাকাল। ভিজেগায়ে আমাদের ঘরের দাওয়ায় উঠে নাতির খোঁজ করল। বাবা বলল, ভেড়া চরাতে গিয়েছে। শুনে নানার ভিজে দাড়িতে হাত আটকে গেল। বলল, আকাশে দেয়া ডাকছে। বাজ পড়ছে, এর মধ্যে মাঠে গেল?

বাবা বললে, বাজ পড়ছে তো কি, তালপাতার ছাতা সঙ্গে আছে।

একথা শুনে আমার নানা সেদিন হেসেছিল না কেঁদেছিল বলতে পারব না, পরদিন সকালবেলা আমাকে কাঁধে তুলে ফকিরডাঙাতে নিয়ে গিয়েছিল। ফকিরডাঙার ওপারে বাদশানগর। সেই বাদশানগর হাইস্কুলে আমাকে ভর্তি করে দিল। দু গ্রামের মধ্যিখানে জলঙ্গী নদী। আমি ডাঙাদেশের মানুষ। সেজন্য আমাদের বলা হত ডাঙালি। নানা আমাকে নদীতে নাইতে নিয়ে যেত। নদীর জলে নাইতে ভীষণ ভয় পেতাম। নানা জোর করে নামিয়ে দিত। বলত, ডুম মার, ডুম মার। আমার কাছে ডুম মারা আর ডুবে মরার কোন পার্থক্য ছিল না। শুধু আমি কেন, ডাঙাদেশের সব মানুষেরই জল দেখলে ভয়। জলে ডুব মারলে মা - বাবা, দেশ - দুনিয়া সবই অন্ধকার। তবু নানার সাশানিতে তার পা ধরে ডুব মারতাম নদীতে। এভাবেই নদী সম্পর্কে প্রাথমিক ভীতি কাটিয়ে উঠতে পেরেছিলাম। ক্লাস ফাইভে ভর্তি এবং তারপর ইস্কুলে যাবার ব্যাপারে সেও এক ভীতিপ্রদ অবস্থা। ওপারের বাদশানগর যেতে হলে খেয়ানৌকোয় পার হতে হয়। নৌকায় উঠে এমনভাবে কাঁপতে থাকতাম, তা দেখে অন্যেরা হাসাহাসি করত। নৌকোর মাঝামাঝি দাঁড়িয়ে থেকে সহযাত্রীদের কোমর চেপে ধরতাম। পরে এসব ভয়ভীতি থেকে নিস্তার পেয়েছিলাম। অবশ্য সময় লেগেছিল। সময় লাগলেও ওই জলঙ্গীতে ভাল সাঁতার শিখেছিলাম। ডাঙাদেশের পুরুষ হিসাবে এ আমার অহংকার।

বাদশানগর হাইস্কুলে আমাকে ভর্তি করার পরের বছর আমার নানা মারা গেল। মারা যাবার মত বয়স অবশ্য তার হয়নি। আমার দুটো মামা। দুই মামারই বিয়ে থা হয়েছে তখন। সন্তানাদিও হয়েছে। মামিরা কাজে ব্যস্ত থাকলে মামাতো ভাইবোনদের কাঁধে করে ঘুরে বেড়াতে হত। এভাবে কটিকাচা আগলাতে গেলে পড়াশুনার ক্ষতি হবে সে তো সোজা কথা। ফলে খুব ভাল ফল কখনো করতে পারিনি। কোনরকমে ঘষটে পাশ করা। এ খবর বছরের একটা নির্দিষ্ট সময়ে ফকিরডাঙা থেকে আমাদের দেশের বাড়িতেপাঠিয়ে দেওয়া হত। আমার বাবা, চাচারা আমার পাশের খবর পেয়ে উল্লসিত হত। কারণ আমাদের পরিবারের কেউ হাইস্কুলে তখনো অবধি পা দিতে পারেনি। আমার ভেড়া না চরানোয় সংসারের ক্ষতি হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু তার চেয়ে ওদের কাছে বড় কথা আমি হাইস্কুলে সিঁড়িগুলো গড়গড় করে টপকে যাচ্ছি।

ইস্কুলের বিদ্যে না থাকলে কি হবে, আমাদের বাড়িতে ধর্মীয় ব্যাপারগুলো যথাযথ পালন করা হত। পাঁচ বছরের দুধের বালককেও রোজা রাখতে হত। রোজার সময় উনুন জ্বালানো হত না। কারণ ওই পবিত্রমাসে উনুন জ্বালানো মানে দোজখের আগুনকে উস্কে দেওয়া। চাচা-চাচিরা পাঁচ ওয়াক্ত নামাজ পড়ত। আমার এক চাচা আবার গাঁয়ের মসজিদে ইমামতি করেন। সেই পরিবারের ছেলে আমি। আমাকে বলতেন, হজরত মহাম্মদ ছাগল চরিয়েছেন, তুমি ভেড়া, চরাচ্ছ, এতে মন খারাপ করো না। ছাগল ভেড়া সব খোদার মাখলুকাত। গাঁয়ের প্রাইমারী ইস্কুলে পড়াকালীন যতবার পরীক্ষা দিয়েছি ততবার ঐ চাচার আশীর্বাদ নিয়েছি। একগ্লাস জলে দোয়া দরুদ লেখা কাগজ ডুবিয়ে আমাকে খেতে দিতেন। সেই জল এক নিঃশ্বাসে খেয়ে ফেলার হুকুম ছিল। আমি তার নির্দেশ মোতাবেক সবটাই গিলে ফেলতাম। আমার বিশ্বাস, ইমানদার চাচার দোয়া কখনো বিফল হতে পারে না। বাস্তবিকই তাই। তা নইলে ভেড়াচরাতে কেউ গাঁয়ের ইস্কুল পাশ করতে পারে? গাঁয়ের ইস্কুল পাশকরা ছেলের তখন কমবেশি মান্যতা ছিল। এখনকার মাধ্যমিক পাশ ছেলেদের ওই মান্যতা কেউ দেয় না। মনে আছে আমাদের বৃত্তি অর্থাৎ চতুর্থ শ্রেণীর শেষপরীক্ষা হয়েছিল শিবমন্দির হাইস্কুলে। আমাদের বিশাল এলাকার মধ্যে ওই একটিই হাইস্কুল। সমস্ত প্রাইমারী বিদ্যালয়ের শেষ পরীক্ষা ওখানেই হত। তখন বলে শিবমন্দিরহাইস্কুল। চাচা বললেন, তৌবা তৌবা।

আমাদের কপাটখোলা প্রাইমারী ইস্কুল থেকে জনা দশেক ছাত্র শিবমন্দির হাইস্কুলে পরীক্ষা দিতে গিয়েছিলাম। ওই পরীক্ষায় পাশ করলে তবে হাইস্কুলে ভর্তি হওয়া। কিন্তু পাশ করা যার তার কথা নয়। ইমানদার চাচা বললেন, কন্মো ভয় নেই, আল্লার উপরে বিশ্বাস রাখ। আমাদের সময়ে পাশ করলে ভাগ্যের দোহাই দেওয়া হত আর ফেল করলে মাস্টারের দোষ। শিবমন্দির হাইস্কুলের মাস্টারমশাইরা নাকি মুসলমান ছাত্রদের বড্ড কড়া করে খাতা দেখেন। ইমানদার চাচা আমার পড়াশুনার ব্যাপারে যে পরিশ্রম করেছেন তা কাউকে বলার নয়।

সারারাত জেগে পবিত্র কোরাণ শরিফ পাঠ করেছেন। শেষরাতে সেইসব আশমানি বাণীর মধ্যে থেকে বাছাই করা দোওয়া কালাম জাফরানি কালিতে লিখে বলেছেন, পরীক্ষার সময় টুপির তলায় থাকলে কারো কুদরৎ নেই ফেল করিয়ে দেয়।

চাচার সব কথা মান্য করা যায়। কিন্তু এই প্রস্তাবে মনটা সায় দিল না। ইদের মাঠে নামাজ পড়ার ব্যাপার হলে টুপি মাথায় দেওয়ার প্রশ্ন আসে। তা বলে পরীক্ষার সময় - আমি বললাম, কোমরে বেঁধে দাও।

একথা শুনে চাচা কুপিত হলেন, মস্তকে যাকে ধারণ করতে হয় তাকে কোমরে বেঁধে রাখলে অসম্মান করা হয়। কোমরের আশপাশে না পাক অঞ্চ ল ওখানে আর যাই আল্লার কালাম বাঁধা যায় না। বাধ্য হয়ে মাথায় টুপি চড়াতে হল। যারা পরীক্ষা দিতে গিয়েছে তারা এবং অন্যেরা আমার পানে ক্যাটক্যাট করে তাকাতে লাগল। ভাবল, আমি কোন মাদ্রাসার ছাত্র ভুল করে চলে এসেছি। অনেকে ভাবল, খুবই ইমানদার পরহেজগার ছেলে আমি। এমনকি ওই হাই স্কুলের মাস্টারমশায়রা পর্যন্ত। চাচার দোয়া কলমার আশীর্বাদে পরীক্ষা ভালই হচ্ছিল। শেষ ঘন্টা বাজার আগেই হঠাৎ গোল বাধল। মাথার টুপি সরে গিয়ে কখন দোয়া কালামের কাগজ বেরিয়ে গেছে খেয়াল ছিল না। একজন মাস্টারমশায় তা দেখে ছুটে আমার কাছে চলে এলেন। টুপির তলা থেকে কাগজটা টেনে নিয়ে তামাম ইস্কুলে হইচই ফেলে দিলেন। এক ইমানদার ছেলের টুকলি ধরা পড়েছে। এটা কম কথা নয়। আমার উত্তর লেখার খাতা কেড়ে নিয়ে অফিস ঘরে মাস্টারমশায়রা মেলাতে ব্যস্ত। আমি কিছু না বুঝে ভ্যাবলা মেরে দাঁড়িয়ে থাকলাম। কিন্তু মাস্টারমশায়রা কী মেলাবেন? আরবি আয়াতের সঙ্গে বাংলা ভাষার একটি হরফের সঙ্গে মিল খুজে না পেয়ে তাঁরা আরো আশ্চ র্য হলেন। বুঝলেন, এ যে সে ছেলে নয়। কোন সাংকেতিক ভাষায় নকল করা হয়েছে। উঃ কী সাংঘাতিক মহা - ধড়িবাজ।

আমি কাঁদো কাঁদো হয়ে বললাম, টুকলি করিনি ছার। কামাল হাতে পেয়ে আমার কথা বিশ্বাস কে করবে? সমস্ত মাষ্টারমশায়রা হল ছেড়ে ততক্ষণে মাথা ঝুঁকিয়ে এই আশ্চ র্য নকল উদ্ধা র করতে গিয়ে গলগলিয়ে ঘাম ঝরিয়ে ফেললেন। আমাদের দেশেরমহা মহা পণ্ডিতরা হরপ্পা মহেঞ্জদড়োর শিলালিপির পাঠ উদ্ধা র করতে পারেন কিন্তু শিবমন্দির হাইস্কুলের শিক্ষকদের সাধ্য কি চাচার দোওয়া কালামের মর্মোদ্ধা র কারে।

বাস্তব জীবনে অনেকক্ষেত্রে বিপদে পড়েছি এমন বেকায়দায় কখনো পড়িনি। শিবমন্দিরের হেডমাস্টার আমাকে বললেন, এ বুদ্ধি কোত্থেকে শিখলে? বললাম, আমি কিছু জানিনে, আমার নকুরদ্দি চাচা জানে।

কই সে নকুরদ্দি?

ঐ গাছতলায়।

আমার পিছন পিছন মাস্টারমশায়দের দঙ্গল। হেডমাস্টারের শক্ত হাত আমার কব্জি চেপে বসে আছে। নকুরদ্দি চাচা বাইরে গাছতলায় আল্লার কাছে পরীক্ষায় ভাল ফলের আরজ জানিয়ে নফল নামাজ পড়ছিলেন। পরীক্ষায় ভাল ফল হলে একজন ইমানদার মানুষ হিসাবে এলাকায় তাঁর নাম ছুটবে। মসজিদ লোকেরা মাস মাইনে বিশ বাড়িয়ে দিতে পারে।

গাছতলায় অন্যান্য লোকজনও আছে। তারা পরীক্ষা শেষে নিজেদের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে করে নিয়ে যাবে। আমাকে যে সাইকেলের ক্যারিয়ারে করে নকুরদ্দি চাচানিয়ে যাবে সেটা গাছের গায়ে হেলানো। আমাকে ওই অবস্থায় পরীক্ষার হল থেকে ধরে আনায় চাচার কেমন যেন সন্দেহ হয়েছিল। চারিদিকে হিন্দুবেষ্টিত গ্রাম। দুধের বালক ভাইপোকে যারা ওই অবস্থায় ধরে আনতে পারে তারা ইমানদার চাচাকে ধরতে পারলে জবাই করে ফেলবে না তা কে বলতে পারে? সাইকেল নামাজের পাটি আর আমাকে ফেলে চাচা যে দৌড় লাগিয়েছিল তা কোথায় এসে থেমেছিল সেদিন, বলতে পারব না।

বাদশানগর হাইইস্কুলে যখন ক্লাস সেভেনে উঠলাম তখন তিনটাকা মাইনে বেড়ে গেল। তিনটাকা মাইনে বাড়া মানে অনেক কিছু। মাইনে দিতে না পারলে পরীক্ষায় বসতে দেওয়া হবে না। আর পরীক্ষায় বসতে না পারলে লেখাপড়ার আর কি দাম থাকল। আমার বড়মামা একদিন ইস্কুলে এসে হেডমাস্টারমশায়ের কাছে আবেদন জানাল, গরীব মানুষ মাস্টার ফিরিতে পড়াবা। হেডমাস্টার আদ্যিনাথবাবু মামাকে চিনতেন বললেন, আপনাদের অবস্থা তো ভাল, ফ্রিতে কেন?

মামা নাছোড়বান্দা। বললে, ওই কথা বলবানা মাস্টার। ওর বইখাতা জামা পেন্টু ল খাতা করল সবই আমাদের কিনে দিতে হয়। হাঁড়ির ভাত না হয় ছেড়েই দিলাম। আমাদের তো মাগ ছেলে আছে না কী? মামার আনপোড় গ্রাম্যভাষা শুনতে শুনতে আমার কান ঝালাপালা করে উঠেছিল। শেষমেষ ফুল ফ্রিতে পড়ার সুযোগ পেলাম। ক্লাস সেভেনে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে নতুন বিষয় যুক্ত হল। সেট আর আরবি অথবা সংস্কৃত। আরবি যে তামাম বিশ্বসাহিত্য থেকে আলাদ বুঝব কী করে? বই খুলতেই মৌলভী স্যার কান চেপে ধরলেন, এটা ইংরিজি, বাংলা না উজবুক, আরবি। সপ্ত আশমানের ভাষা। এই ভাষাতেই কোরাণ নাজিল হয়েছে। বলে পুরো বইটা উল্টে দিলেন।

ফকিরডাঙার আবদুল্লা - আমার চেয়ে দু ক্লাস উপরে পড়ে। সে বললে, আরবি পারবি তো পারবি, না পারলে হেগে মুতে মরবি।

সত্যি কথা বলতে কি, আরবি সম্বন্ধে নানা কথা শুনে আমার মাথা ঘুরতে লাগল। আরবি ছেড়ে পণ্ডিতমশায়ের দ্বারস্থ হলাম। উনি বসলেন, বলিস কী! মোছলমানের ছেলে সংস্কৃত শিখে কী পুরুতগিরি করবি?

বললাম, না স্যার, পাশ নম্বর হলেই হবে। নইলে মামারা বাড়ি থেকে খেদা করবে। বাবা গরীব মানুষ। পরের বাড়িতে রাখালি খাটাবে।

পণ্ডিতস্যার রাজি হলেন। তবে শর্ত একটাই, ওঁর কাছে টিউশনি পড়তে হবে। শুধু আমি নয়, আমার মত বেশ কয়েকজন মুসলমান ছেলে আরবি ছেড়ে সংস্কৃত নিল। উনি সপ্তাহে তিনদিন আমাদের সংস্কৃত পড়াতেন। যারা নিয়মিত পড়তে যেত, আর বেতন পরিশোধ করত পরীক্ষার আগে উনি তাদের মাথায় পৈতে ছুঁইয়ে দিতেন। কোন ছাত্রের মাথায় যদি ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পৈতের ছোঁয়া পড়ত তাহলে সে ছাত্র যত আকাটই হোক না কেন কখনো ফেল করতে পারে না। আসলে পৈতে ছুঁইয়ে উনি পরীক্ষায় যে সবপ্রশ্ন আসবে সেগুলি দাগিয়ে দিতেন। যার ফলে অন্যান্য বিষয়ের তুলনায় সংস্কৃতেই সবচাইতে বেশি নম্বর পেতাম। অবশ্য পণ্ডিতমশাইকে নগদ অর্থ দেবার ক্ষমতা আমার ছিল না। সে কারণে মাঝে মাঝে তাঁর কাছে পড়াশুনায় ছেদ পড়ত। লুকিয়ে চুরিয়ে মামাবাড়ি থেকে তেল ডাল কাঁচকলা কি আম নিয়ে যেতাম। এসব জিনিস পেলে উনি খুব খুশি হতেন। আমি বলতাম, মামা আপনাকে খেতে দিয়েছে। একবার একটা আস্ত কাঁঠাল সবার অগোচরে গাছ থেকে পেড়ে নিয়ে গিয়েছিলাম। ভাবলাম পরীক্ষায় ভাল নম্বর হবে। পরীক্ষার রেজাল্ট হাতে পেয়ে আমার তাক লেগে গেল। সবচেয়ে কম নম্বর সংস্কৃতে। কী করে সম্ভব। পণ্ডিত স্যারের কাছে গিয়ে বললাম। পণ্ডিত মশায়, মাত্র ত্রিশ নম্বর।

উনি আমার পানে একটিবার চেয়ে খিক খিক করে হেসে উঠলেন, ত্রিশ নম্বরের বেশি কি করে হয়। তুই যে কাঁঠালটা দিয়েছিলি তার যে ত্রিশটার বেশি কোয়া ছিল না।

পণ্ডিতমশাই মুখের উপর বললে আমি তা অস্বীকার করতে পারি না। বললাম, সামনের বার বড় কাঁঠাল দেব। বেশি নম্বর চাই। মুখে যতই বলি মামা আপনাকে খেতে দিয়েছে, পণ্ডিতমশাই বুঝতে পারতেন এত জিনিস কেউ কখনো কাউকে খেতে দেয় না। বইয়ের ব্যাগটা ভারি ভারি আন্দাজ হলে উনি চোখ টিপে পাশ ঘরের দিকে ইঙ্গিত দিতেন। পণ্ডিতমশাই, শ্রী কমল চক্রবর্তীর কাছে তাই আমার আলাদা খাতির ছিল। উনি যখন বাড়িতে খাতা দেখতেন তখন আমি আঠারোকে একাশি বানিয়ে দিতে পারতাম। এভাবেই ক্লাস নাইনে উঠেছি। এক বছর পর টেনে। আমাদের কপাটখোলার বাড়িতে ছেলের পাশের খবর গিয়েছে। এই সুখবরের সঙ্গে আর একটা কুখবর পৌঁছে গেছে তা হল, ছেলে নাকি কাফেরের ভাষা পড়ছে। মামার বাড়িতে গিয়ে ছেলে গোল্লায় গিয়েছে। ওর থেকে ভেড়া চরানো ভাল ছিল। তামাম বাড়ি জুড়ে অশান্তি তৈরি হল। নকুরদ্দির চাচার কোরাণ হাসিদ মুখস্ত। বললেন, আমাদের চৌদ্দপুরুষ দোজকে যাবে।

যে ছেলেকে নিয়ে গোটা পরিবার গাঁয়ের মধ্যে গর্ব প্রকাশ করত, আজ সেই ছেলে এমন মহাপাতক হয়ে উঠবে কে জানে। শুধু মামাদের পরিবারের মধ্যে নয়, কপাটখোলার সব লোকের মধ্যে এ খবর ছড়িয়ে পড়ল। মামারা বলল, ও কী পড়ছে আমরা তার কী জানি। পড়ে চাকরি করলে কি আমাদের খাওয়াত? দরকার নেই ভাগ্নে পুষে। বলে মামারা আমাকে বাড়ি রেখে আসল। আমি বাড়ি এসেছি শুনে পাড়া বেপাড়ার লোক ভেঙে পড়ল। মা ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। যে চাচা মসজিদে ইমামতি করেন সে নকুরদ্দি চাচার কর্মতৎপরতা সবচেয়ে বেশি। একটা বড় নাদাতে তাঁর হুকুমে জল ভর্তি করা হয়েছে। সেই জল সামনে করে তিনি অনর্গল কোরাণপাঠ করেছেন আর মাঝে মাঝে ফু চালাচ্ছেন, সেই পবিত্র হবার ওই পদ্ধ তি। আমার বড় চাচা নতুন সাবান গামছা আর লুঙ্গি কিনে নিয়ে আসতেই আমার মাথায় জল ঢালা হল। সাবানে সাবানে আমার গায়ে মাথায় তখন সাতসাগরের ফেনা। শীতকাল। বদনা বদনা জলে তখন আমি কাঁপছি। প্রাথমিক স্নান শেষে নকুরদ্দি চাচা আমাকে বললে, বল, লা এলাহা ইল্লোল্লাহা মোহাম্মদের রসুলউল্লা।

আমার মুখ দিয়ে বেরিয়ে গেল, মহাদেবের রসুলউল্লা। নকুরদ্দি চাচা চেঁচিয়ে উঠল, তৌবা নবীর নাম জবানে আসছে না শয়তান ভর করেছে জিভে। তোমরা সবাই দোয়া কলমা পড়, পানিতে ফু দাও। আরো পানি ঢালো। সাফা গোছল না হলি জবান শুদ্ধ হবে না।

চাচার কথায় আরো পানি ঢালা হল। আমার মাথায় সেই পবিত্র পানি অকাতরে ঢালা হতে লাগল। গায়ে সাবান, সাবানের ফেনা। নকুরদ্দি চাচার মুখে পবিত্র কোরাণের আয়াত। শীতের হিম পানির স্পর্শে অজানিত মহাপাপবোধে কাঁপতে কাঁপতে পশ্চি মআকাশের দিকে চেয়ে অজস্র পেঁজা তুলোর মত সাদা মেঘপুঞ্জকে উড়ে আসতে দেখছিলাম। দেখতে দেখতে কেন না জানি আমার মনে হচ্ছিল, ওগুলো যেন মেঘ নয়। এক পাল ভেড়া, যে ভেড়াগুলোকে আমি ঘন ঘোর বর্ষায় অন্ধকার হয়ে আসা মাঠে একাকী চরিয়ে বেড়াতাম।